॥ রাম ॥

'রামের সুমতি'-র প্রথম অংশ ১৩১৯ সালের 'যমুনা'-র ফাল্গুন সংখ্যায় এবং দ্বিতীয় অংশ চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। গল্পটির ভাব, ভাষা, কাহিনী ও চরিত্র সৃষ্টি লেখকের অসামান্য প্রতিভার পরিচায়ক। এখানে তিনি স্নেহ ও বাৎসল্যের সম্মিলিত রূপকে পরিস্ফুট করে নারী চরিত্র এবং শিশুমনের সুনিপুণ বিশ্লেষণ করেছেন। গল্পটির প্রধান চরিত্র রাম। তাকে কেন্দ্র করেই কাহিনীটির বিস্তার। সে পিতৃমাতৃহারা বালক। বয়স বারো তের বছর, বৈমাত্রেয় দাদা ও বৌদির নিকট প্রতিপালিত এবং তার সর্বক্ষণের খেলার সাথী ভাইপো গোবিন্দ। সে যদিও মাতৃহারা তবে মাতৃসমা বৌদির কাছ থেকে আদর — যত্ন - স্নেহ-ভালবাসা লাভ করে কোনদিন-ই মায়ের অভাব বুঝতে পারে নি। তার যতকিছু আবদার সব বৌদির কাছে, আর বৌদি-ও মাতৃহারা দেবরটি-কে নিজ পুত্রসম স্নেহ করতেন।

রামের সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র প্রথমেই বর্ণনা করেছেন 'রামলালের বয়স কম ছিল, কিন্তু দুষ্টবুদ্ধি কম ছিল না। গ্রামের লোকে তাহাকে ভয় করিত। অত্যাচার যে তাহার কখন্ কোন্ দিক দিয়া কিভাবে দেখা দিবে, সে কথা কাহারও অনুমান করিবার জো ছিল না।'[৬৪] —— এর থেকে বোঝা যায় সে খুব দুরন্ত এবং এই গুণটি তার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। সে কখনও পরের বাড়ী থেকে শশা চুরি করেছে, কখনও আবার রক্ষাকালীর জিভ বড়ো না শ্মশানকালীর জিভ বড়ো — এই বিষয়ে শিশুসুলভ তর্কে জমিদারের ছেলের সঙ্গে মারামারি করে তার মাথা ফাটিয়েছে — আর এরজন্য বৌদি তাকে শাস্তি দিয়েছে, কড়া শাসনে রাখবার চেষ্টা করেছে — কিন্তু সে চেষ্টা বৃথাই হয়েছে। তবে বৌদির শাসনের কাছে সে যেমন সাময়িক ভীত হয়ে পড়ে, তেমনি স্নেহ ভালবাসার স্পর্শেও ছোট বালকের মত নতি স্বীকার করে আনুগত্য প্রকাশ করে। যেমন, একবার সে তার শিশুসুলভ খেয়াল চরিতার্থ করতে উঠানের মাঝখানে অশ্বত্থ গাছ পোঁতে এবং স্কুল থেকে ফিরে এসে গাছটি না দেখতে পেয়ে (নারায়ণীর মা দিগম্বরী তা উপরিয়ে ফেলে দেওয়ায়) চিৎকার চেঁচামেচি করলে, নারায়ণী তাকে সান্ত্বনা দিয়ে ভুলিয়েছে যে, পাঁজিতে লেখা আছে মঙ্গলবার অশ্বত্থ গাছ পুঁততে নেই এবং মঙ্গলবার পাঁজিও দেখতে নেই। এইরকম স্নেহের স্পর্শেই রামের উৎকট দুরন্তস্বভাব শান্ত হতো।

আসলে দিগম্বরীর স্নেহহীন ঈর্ষাপূর্ণ মনোভাবের ফলেই তার ঐ দুরন্ত স্বভাবটি উত্তেজিত হয়ে অশান্ত হয়ে উঠতো। আর তখন সে দিগম্বরী-কে নানারকম অসম্মানসূচক কথা বলতো (যেমন'ডাইনী বুড়ী ইত্যাদি), সেই সময় নারায়ণীর স্নেহের স্পর্শে সে শান্ত হতো এবং প্রতিজ্ঞা করতো আর দিগম্বরীকে অপমানসূচক কথা বলবে না। কিন্তু বলা বাহুল্য , সে তার ঐ প্রতিজ্ঞা রাখতে পারে নি , স্বভাবসুলভ দুষ্টামি-তে আবার মেতে উঠেছে।

নারায়ণীর এই স্নেহশীলতার প্রভাব রামের মধ্যেও সঞ্চারিত হয় এবং তা প্রকাশ লাভ করে বৌদি-র প্রতি আচার আচরণের মাধ্যমে। যেমন, বৌদির জ্বর হয়েছে শুনেও যখন ভক্তি ডাক্তার আসে নি, তখন সে নিজে ডাক্তার-কে গিয়ে শাসিয়ে এসেছে এবং ডাক্তারটি-ও ছোট বালকটির ভয়ে-ই বোধ হয় জাল ওষুধ নয়, আসল ওষুধ নিয়ে হাজির হয়েছে।

রাম চঞ্চল। এই বৈশিষ্ট্যটির বশবর্তী হয়ে সে কখনও পরের বাড়ী শশা কাটছে, কখনও অশ্বত্থ গাছ পুঁতছে আবার পর মুহূর্তে সে সব ভুলে কাঁচা পেয়ারা পাড়ছে। স্কুলে গিয়ে রফেকালী ও শ্মশানকালীর জিভের দৈর্ঘ্য ও প্রশস্ততা নিয়ে মারামারি করেছে কিন্তু তারপরে-ই আবার সেই সব কথা বিস্মৃত হয়েছে। আবার বৌদি-র কাছে সে একসময় যা অঙ্গীকার করেছে, পরমুহূর্তে তা ভুলে গিয়ে আবার সেই কাজ করেছে, পুনরায় প্রতিজ্ঞা করে অল্প কয়েকদিন পরেই তা বিস্মৃত হয়েছে। আসলে রামের শিশুমনের চির চঞ্চলতার সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে অবাধ উন্মুক্ততা। যার ফলে তার স্বাধীনচারী মন সমস্ত প্রকার শাসন থেকে মুক্তি লাভ করতে চেয়েছে।

এরপর তন্ময়তা। রামের দুটো প্রিয় রোহিত মৎস্য' ছিল। মাছ দুটো 'বহুদিনের পুরাতন এবং ঘাটের কাছে সর্বদাই ঘুরে বেড়াত' আর মানুষ-কে বিশেষ ভয় করতো না। রাম বলতো , 'এরা তার পোষা মাছ এবং নাম দিয়াছিল কার্ত্তিক , গণেশ। এ পাড়ায় এমন কেহ ছিল না, যে ব্যক্তি কার্ত্তিক গণেশের অসাধারণ রূপগুণের বিবরণ রামের কাছে শোনে নাই এবং তাহার অনুরোধে একবার দেখিতে আসে নাই। কি যে তাহাদের বিশেষত্ব, তাহা কেবল সে-ই জানিত এবং কে কার্ত্তিক, কে গণেশ xxx শুধু সে-ই চিনিত। ভোলা-ও সব সময় ঠাহর করিতে পারিত না বলিয়া রামের কাছে

কানমলা খাইত ।'[৬৫] রাম যে তাদের সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারতো তার মূল কারণ হচ্ছে সে তাদের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে থাকতো ।

রাম সরল । তার এই সারল্যের প্রকাশ ঘটেছে, যখন অপরের বাড়ী শশা কাটাতে নারায়ণী তাকে চুরি করে শশা নেওয়ার জন্য বকেছে তখন সে রীতিমত বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছে 'চুরি কচ্ছিলুম ? কখ্খনো না । এতটুকু শশা নিলে চুরি করা হয় ?'[৬৬] —— এই হচ্ছে শিশুর মনের সরলতা । তার শশা খেতে ইচ্ছে করেছে তাই সে পেড়ে খেয়েছে, একে কোনমতেই চুরি করে খাওয়া বলে মানতে সে রাজী নয় ।

রামের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য সম্ভ্রমবোধ । উল্লেখযোগ্য যে, শিশুর এই সম্ভ্রমবোধ খুব-ই তীব্র । যদিও তা পরিণত বয়স্কদের মত নয়, তবুও তুচ্ছ নগণ্য ঘটনা-কে কেন্দ্র করেই তার অভিব্যক্তি হয় । রাম কিছুতেই মানতে রাজী নয় যে, পাঁজিতে লেখা আছে মঙ্গলবার অশ্বত্থ গাছ পুঁততে নেই, এবং ঐদিন পাঁজী-ও দেখতে নেই । কিন্তু যখন শোনা গেল যে, এই সামান্য ব্যাপারটা ভোলা-ও জানে তখন সে আর তর্ক করে নি, কারণ তাহলে ভোলার কাছে তার সেই অজ্ঞতা ধরা পড়বে ফলে সম্ভ্রম ক্ষুণ্ন হবে ।

নিকটতম প্রিয়জনের সঙ্গে বিচ্ছেদ হলে মানুষের মনে অনুশোচনা, আত্মাভিমান, লজ্জা, ক্ষোভ, বিরক্তি ইত্যাদি নানারকম ভাবের অভিব্যক্তি হয়, তখন সকলেই মনে মনে পূর্বের ঘটনা পর্যালোচনা করে । শিশুর মনের মধ্যেও পরিণতবয়স্ক মানুষের মত এইরকম ভাবের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় । বৌদি-কে কাঁচা পেয়ারা দিয়ে আঘাত করার ফলে যে ভীষণ পরিণতি হলো তারজন্য রাম ঠিক প্রস্তুত ছিল না । সেইজন্য বৌদির প্রতি তার এই ব্যবহারের পরিণতি স্বরূপ ছোট মনটিতে অনুশোচনা জাগে এবং নারায়ণীর ঐ আঘাত যে কতখানি তার হৃদয়ে বিদ্ধ হয়েছে, তা বোঝা যায় যখন সে নির্জনে একাকী একটা পেয়ারা দিয়ে নিজের মাথায় ঠুকেছে । সে ভেবেছে তার যতটা লাগছে বৌদির সেই তুলনায় নিশ্চয়ই বেশী লেগেছে । আর এই ভেবে বৌদির প্রতি তার ঐ আচরণের জন্য অনুতপ্ত হয়ে সন্ধি করবার নানারকম শিশুসুলভ অভিনব পন্থা অবলম্বন করেছে ।

রাম নারায়ণী কর্তৃক প্রতিপালিত বালক । তার চরিত্রে বৌদি-র স্নেহ ভালবাসা অনেকখানি প্রতিফলিত । দিগম্বরীর স্নেহহীন হৃদয় এবং ঈর্ষাপূর্ণ মন ঐ মাধুর্যের সন্ধান পায় নি । আসলে ঐ স্নেহশীল হৃদয় নারায়ণীর স্নেহের স্পর্শেই জাগরিত হয় । এছাড়া

শরৎচন্দ্র তার চরিত্রে একটি শিশুর যাবতীয় গুণাবলী আরোপিত করায়, সে শেষপর্যন্ত একটি শিশু বালকের জীবন্ত প্রতিরূপ হয়ে উঠেছে। তবে গল্পটিতে রামের উপস্থিতির প্রধান কারণ হচ্ছে নারায়ণীর হৃদয়ের বাৎসল্য রসের চিত্রকে উদ্‌ঘাটিত করা। সে তার পুত্র গোবিন্দকে যে ভালবাসতো না তা নয়, তার চরিত্রের বিশেষত্ব এই যে, তার কাছে গোবিন্দ আর রামের মধ্যে কোন প্রভেদ ছিল না।

॥ গোবিন্দ ॥

'গোবিন্দ ছিল রামের বাহন। চব্বিশ ঘণ্টাই সে কাছে থাকিত এবং সব কাজে সাহায্য করিত।' [৬৭] রামের হুকুম মতো কখনো সে পাখীর খাঁচা ধরে, কখনও ঘুড়ি তৈরী করতে সাহায্য করে আবার কখনও বা তার সামর্থ্যানুযায়ী ছোট ঘটি করে জল আনে অশ্বত্থ চারা গাছে দেবার জন্য। রাম তার এই ছোট ভাইপোটিকে খুব ভালবাসে। তারই জন্য সে উঠানের মাঝখানে অশ্বত্থ গাছ পোঁতে, কারণ ঐ গাছটি থাকায় যেমন 'চমৎকার ছায়া হবে' আবার 'ছোট ডালটি - - - বড় হলে গোবিন্দর জন্যে একটা দোলা' করবার পরিকল্পনাও সে করে। মূলতঃ রামের সহচর হিসেবেই তাকে উপস্থাপিত করা হয়েছে গল্পে।

॥ ভোলা ॥

ভোলা গৃহভৃত্য। সে প্রায় রামের সমবয়সী। গোবিন্দর মতো সেও রামের সব কাজের সহচর এবং খেলার সাথী। রাম যখন শিশুসুলভ খেয়াল চরিতার্থ করতে উঠানের মাঝখানে মহা সমারোহে অশ্বত্থ গাছ পুঁতেছে, তখন গোবিন্দ যেমন তাকে জল এনে সাহায্য করেছে তেমনি ভোলাও বেড়া দেওয়ার জন্য 'একরাশ বাঁশ ও কঞ্চি টানিয়া' এনেছে। দিগম্বরী রামের প্রিয় মাছ কার্তিক ও গণেশকে ধরবার জন্য যখন লোক ঠিক করেছে তখন ভোলাই তাকে চুপিচুপি খবর দিয়েছে 'দা ঠাকুর ভগা বাগদী তোমার কেত্তিক - গণেশকে চাপবার জন্য জাল এনেছে, দেখবে এসো।' [৬৮] রাম কিন্তু তখন তার কথা বিশ্বাস করে নি কারণ সে জানতো মাছ দুটির কথা গ্রামের সকলেই জানে তাই কেউ ধরবে না। এদিকে মাছ যখন ধরা হয়ে গেলো তখন ভোলা বিচলিত হয়ে উঠেছে

রামকে খবরটা দেবার জন্য । 'কখন কোন্ স্থানে রামকে পাওয়া যাইবে, ভোলা তাহা জানিত । সে ছুটিয়া গিয়া বাগানের উত্তর-ধারের পিয়ারা তলায় আসিয়া উপস্থিত হইল । রাম একটা ডালের উপর বসিয়া পা ঝুলাইয়া পিয়ারা চিবাইতেছিল, ভোলা হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, দেখবে এস দাঠাকুর, ভগা তোমার কাত্তিককে মেরেছে ।'[৬৯] আবার দিগম্বরীর চক্রান্তে রামকে যখন পৃথক করে দেওয়া হলো তখন ভোলা-ও থাকলো তার সঙ্গে তাকে সাহায্য করার জন্য গৃহস্থালীর ব্যাপারে । রাম এখন ভোলার মনিব । সে তাকে মনিবসুলভ হুকুম করে বলে 'তুই আমার চাকর, ও বাড়ি যাসুনে । ও-বাড়ির কেউ যদি এদিকে আসে, তার পা ভেঙে দিবি — বুঝলি ভোলা - - - ।[৭০] ভোলা-ও তৎক্ষণাৎ তার মনিবের কথায় সায় দিয়েছে । কিন্তু নারায়ণী যখন রামের খবর পাওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব তখন সে চুপি চুপি এসে তাকেও রামের খবর দিয়েছে । আবার রাম যখন মামার বাড়ী চলে যেতে মনস্থ করেছে তখন ভোলা নারায়ণীর কাছে গিয়ে বলেছে , '- - - তুমি যা বলেছিলে মা, তাই হয়, যদি দুটি টাকা দাও । - - - তুমি দাঠাকুরকে চলে যেতে বলেছিলে না ! তিনি যেতে রাজী আছেন — আচ্ছা , দুটো না দাও, একটি টাকা দাও । - - - বাইরে গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছেন ! বাবার থানের ওদিকে কোথায় তেনার মামার বাড়ী আছে যে !'[৭১] এই কথা শুনে নারায়ণী বিচলিত হয়ে পড়েছে এবং তারই নির্দেশে সে ছুটে গিয়ে রামকে ডেকে এনেছে । শরৎ চন্দ্র গল্পটি-তে ভোলা-র চরিত্রের চরিত্রিক বিকাশ দেখান নি, কেবলমাত্র ঘটনা পরম্পরায় তার উপস্থিতি এবং কার্যকলাপের প্রয়োজনীয়তার জন্য-ই তার আবির্ভাব ।

॥ সুরধুনী ॥

সুরধুনী নারায়ণীর বোন । বয়স তার দশ বছর । লেখক গল্পের কোন প্রয়োজন সাধনে চরিত্রটি সৃষ্টি করেন নি । তবে দিগম্বরীর স্বার্থপর মনোভাবের (রামের প্রতি) পশ্চাতে যে প্রচ্ছন্নভাবে বেদনা রয়েছে (যেমন, মাতৃহারা রামের প্রতি নারায়ণীর ভালবাসা, তার স্বাচ্ছন্দবোধের প্রতি সজাগ দৃষ্টি ইত্যাদি যেমন রয়েছে, কিন্তু সুরধুনী তার বোন হওয়া সত্ত্বেও তার প্রতি যেন নারায়ণীর সেইরকম স্নেহ ভালবাসা নেই এইরকম একটা মনোভাব) সেই ব্যাপারটি-কে প্রস্ফুটিত করার জন্যই সুরধুনী চরিত্রটির অবতারণা ।